E-CONTENT PREPARED BY

Dr. Shreya Ray

Assistant Professor

Department of Bengali

Durgapur Government College, Durgapur, West Bengal

(***Affiliated to Kazi Nazrul University, Asansol, West Bengal***)

NAAC Accredited "A" Grade College

(Recognized under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act 1956)

E-Content prepared for students of

B.A. Generic (Semester- I) in Bengali

Name of Course: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

Topic of the E-Content:

নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য

নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে –

◆ বিশ শতকে চল্লিশের দশকে বিজন ভট্টাচার্যের আবির্ভাবকাল ও সমকালীন প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে পারবে।

◆ তাঁর বিভিন্ন নাটকের নাম,প্রকাশকাল এবং নাটক সম্পর্কিত ধারণা পারবে।

◆ তাঁর লেখা নাটকের বিশেষত্ব কি ,সে সম্পর্কিত জানতে পারবে।

ভূমিকা : -

বাংলা নাটকের সূত্রপাত কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিবাদের ধারায় ঘটেনি, প্রাথমিকভাবে তার উদ্দেশ্য বিত্তবানের মনোরঞ্জন। কিন্তু যে-কোনো লেখকেরই দুটি সত্তা থাকে—একটি তাঁর শিল্পীসত্তা, অপরটি সামাজিক সত্তা। তাই শুধু শিল্প-সৃষ্টি বা বিনোদনের তাগিদে নয়, বিশেষ যুগ ও কালের সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেও নাটক লেখা হতে থাকে। সমাজ ভাবনার দায়বদ্ধতায় দর্শক ও পাঠককে চেতনার আলোকে উজ্জীবিত করে তুলতেই এর সার্থকতা, মানুষের জন্যই সমাজের কাছে শিল্পীর কমিটমেন্ট। তাই বাংলা নাটকের প্রথম পর্বেই মঞ্চস্থ হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ) নাটক। কৌলিন্য প্রথার প্রতি ধিক্কার এ নাটকের উপজীব্য। বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেও তিনি নাটক লেখেন। এরপর থেকেই বহু নাট্যকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন কখনো সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে, কখনো কোনো রক্ষণশীল আচার-প্রথার বিরুদ্ধে, কখনো ব্রিটিশ বিরোধিতায়। উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে বাংলা নাটকে দেশানুরাগ, জাতি-প্রীতি, বিদেশি অত্যাচারীর স্বরূপ ও প্রকৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা, বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশমাতার মুক্তি সাধনের চেষ্টা লক্ষিত হয়। তবে বিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন দিকে বাঁক নিতে শুরু করে। এই সময় রাজনৈতিক স্বাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের প্রশ্নও উঠে আসে। শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষেরা সরাসরি প্রতিফলিত হয় নাটকে। শুধুমাত্র রাজশক্তি নয়, অন্যান্য সমাজ শত্রু যারা বিদেশি শাসনের সুযোগে নানাভাবে শোষণ-অত্যাচার করছে তাদেরকেও প্রতিপক্ষরূপে চিহ্নিত করা হল। সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজন ও অনিবার্যতায় মার্কসবাদী প্রত্যয়ে স্থির বিশ্বাসী বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৫-১৯৭৮)-ও তাঁর নাটকগুলিতে প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজ্যের অবস্থার প্রেক্ষাপটে 'প্রতিবাদ-প্রতিরোধের' কথা উচ্চারিত করে সুস্পষ্টভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলনের কথা উচ্চারণ করেছেন, তার নাটকগুলিকে গণচেতনা ও গণজাগরণের হাতিয়ার করে তুলেছেন।

জন্মপরিচয় ও রচনাশৈলী : -

ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি দরদ এবং তাদের লড়াকু শক্তির ওপর বিশ্বাসের শিল্পী বিজন ভট্টাচার্যের জন্ম। তাঁর নাটকগুলিতেও সেই মানবিক মূল্যবোধের প্রকাশ। আর এই সূত্রেই তিনি লেখেন একের পর এক যুগান্তকারী নাটক,নিম্নে তার তালিকা ও প্রকাশকাল দেওয়া হল -

নাটক	প্রকাশকাল
আগুন	১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
জবানবন্দী	১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
নবান্ন	১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
অবরোধ	১৯৪৬-৪৭ খ্রিস্টাব্দ
কলঙ্ক	১৯৫৫-৫১খ্রিস্টাব্দ

জননেতা	১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ
গোত্রান্তর	১৯৫৭-৫৭ খ্রিস্টাব্দ
দেবীগর্জন	১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ
মরাচাঁদ	১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ

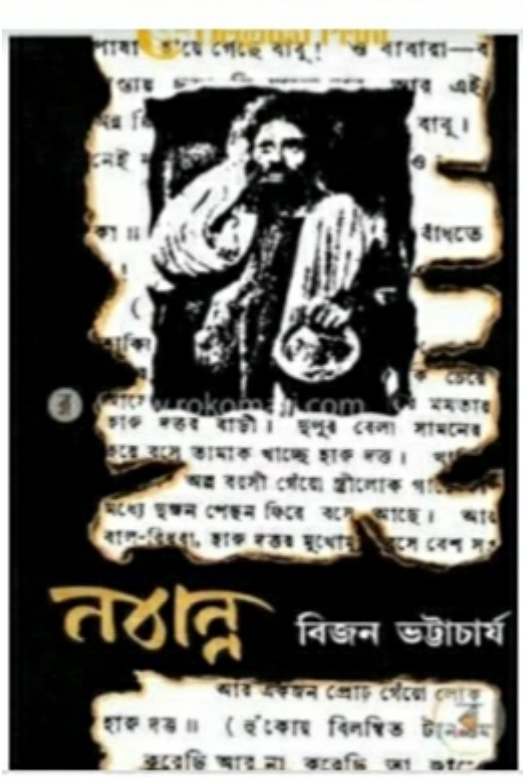
নঠান্ন
বিজন ভট্টাচার্য

দেবীগর্জন
বিজন ভট্টাচার্য

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরূপে মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার পেছনে শোষক ও পীড়ক শক্তিকে তিনি শুধু আবিষ্কারই করেননি, তার স্বভাব ও প্রকৃতির স্বরূপ উন্মোচন করেছেন ও প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মাধ্যমে উত্তরণের পথ নির্দেশও করেছেন। শুধু তাঁর নাটকে নয়, কবিতাতেও তার বহিঃপ্রকাশ—

শুরু হোক
পৃথিবীর বুকে পলাশের রঙে রাঙা
বসন্তের নতুন সংলাপ...।

(বসন্তের নতুন সংলাপ)

সমকালীন নাট্যকার ও বিজন ভট্টাচার্য : -

শুধুমাত্র বিজন ভট্টাচার্য নয়, তাঁর সমকালে ও উত্তরকালে মন্মথ রায়, সলিল সেন, উৎপল দত্ত, তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নাট্যকারগণও সমাজ সচেতন প্রগতিধর্মী নাটক রচনা করেছেন। দেখিয়েছেন ভিক্ষা-প্রার্থনার প্রসারিত হাত মানুষের মুক্তি এনে দিতে পারে না, বজ্রমুষ্টির আন্দোলিত দৃঢ় উত্তোলিত হাত-ই পারে মুক্তিকামী মানুষের বাঁচার সম্ভাবনাকে পথ দেখাতে। আর এই সূত্রেই চলে আসে 'ধর্মঘট', 'নতুন ইহুদী', 'তরঙ্গ', 'বাস্তুভিটা', 'অঙ্গার', 'দুঃখীর ইমান', 'পথিক', 'দীপশিক্ষা', 'সংক্রান্তি'-র মতো সমাজ সচেতন নাটক যেগুলি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে মানুষকে উজ্জীবিত করে। আর এরই মতো বিজন ভট্টাচার্যের নাটকেও দেখা গেল অবরোধের আঙিনায় দাঁড়িয়ে মুক্তির প্রয়াস, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ, অসাম্যের বিরুদ্ধে অধিকারবোধ সমস্ত শাসন-শোষণ-জুলুম-বঞ্চনা-অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সচেতন সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ। কীভাবে সেই অপ্রাপ্তিজনিত অসন্তোষ ও সংঘাতকে নাট্যকার সুনিপুণভাবে নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন সেই আলোচনায় যাবার আগে দেখে নেওয়া যাক বিজন ভট্টাচার্যের নাটকের রচনার প্রেক্ষাপট কালটি।

সমকালীন সমাজ-পরিবেশ : -

ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ এবং গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত থেকেই বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যজীবনের সূত্রপাত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বৈরতন্ত্রের বিকাশ, সাম্রাজ্যবাদীর আস্ফালন, গণতন্ত্রের অপমৃত্যু এসবের বিরুদ্ধে কথা বলতে তৈরী হয়েছিল গণনাট্য সংঘ। চারের দশকে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই একটার পর একটা ভয়াবহ ও মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হল বাংলার মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫ খ্রি.), ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতের জনগণের ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ব্রিটিশের দমন-পীড়ন, অত্যাচার, ভয়ংকরতম দুর্ভিক্ষ ও ব্রিটিশের চক্রান্ত, দেশীয় মানুষের লোভ ও যুদ্ধের পরিণতিতে ঘটে যাওয়া মন্বন্তর (১৯৪৩ খ্রি.), দাঙ্গা

(১৯৪৬ খ্রি.), দেশভাগ (১৯৪৭ খ্রি.)–এক ঘোর সংকট দেখা গেল জনজীবনে। এরই পরোক্ষ ফল বোমাতঙ্ক, কালোবাজারি, মজুতদারি, মুনাফাবাজি, অবশ্যম্ভাবী মূল্যবৃদ্ধি, হতাশা, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু। এছাড়া স্বাধীন ভারতে জমিদারি ব্যবস্থার বিলুপ্তির পর মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উদ্ভব, শ্রমিক জীবনের নানা অসংগতি ও যন্ত্রণা, দেশবিভাগের মর্মন্তুদ পরিণতি হিসাবে উদ্বাস্তু সমস্যার তীব্রতা সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে এনেছিল আকস্মিক বিপর্যয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে মানুষের দুর্দিনে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য একজন সমাজ সচেতন সংগ্রামী শিল্পীর মতোই তাঁর সময়কালের মানুষের জীবনসংগ্রামের কথাই তুলে ধরেছেন বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নাটকগুলিতে। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে লেখা প্রথম নাটক 'আগুন' থেকে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লেখা 'হাঁসখালির হাঁস' প্রায় সব নাটকেই নাট্যকার আবহমান কালব্যাপী মানুষের জীবনযন্ত্রণা ও প্রতিবাদের মাধ্যমে মুক্তির রূপটিকে তিনি খুঁজে পেতে চেয়েছেন।

নাটকের মূল বিষয়বস্তু : -

নাট্যকার, অভিনেতা, নাট্যপরিচালক, প্রযোজক এবং নাট্যসংগঠনে অক্লান্তকর্মী রূপে বিজন ভট্টাচার্য দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর বাংলা নাটক, নাট্যাভিনয় ও নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থেকে তার ক্রমোন্নয়নে কাজ করে গেছেন। ১৯৪৩–১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে সমকালীন ইতিহাসের কয়েকটি বিশেষ সমস্যা তাঁর নাটকে প্রস্থান ভূমিরূপে উঠে এসেছে, যার মধ্যে একটা ঐতিহাসিক পর্যায়ক্রমেও যেন ধরা পড়ে। আলোচনার সুবিধার জন্য এগুলিকে সাজালে পাই—

◆ ১৯৪৩-এর মন্বন্তর ও খাদ্য মজুত করে কৃত্রিম খাদ্যাভাব সৃষ্টি, দুর্ভিক্ষের ও প্রতিবাদের ছবি–'আগুন', 'জবানবন্দী'।

◆ ১৯৪২–এর আগস্ট আন্দোলন ও দুর্ভিক্ষ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ—'নবান্ন'।

◆ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে মার্কিন মিলিটারি ও বেদে সম্প্রদায়ের সংঘাত–'কলঙ্ক'।

◆ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীকূলের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘাতচিত্র- 'অবরোধ' ও 'জতুগৃহ'।

◆ দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা—'গোত্রান্তর'।

◆ স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে দুর্নীতিবান শক্তিমানদের সঙ্গে সাধারণ কৃষকদের বিদ্রোহ—'জননেতা', 'দেবীগর্জন'।

◆ জাত শিল্পীর বাস্তব জীবন ও শৈল্পিক অঙ্গীকারের দ্বন্দ্ব - 'মরাচাঁদ'

'আগুন' এই একাঙ্কটি থেকে শুরু করে 'দেবীগর্জন' পূর্ণাঙ্গ নাটকটি পর্যন্ত রচনাকালকে বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যরচনার প্রধানতম অংশ হিসাবে ধরা যেতে পারে। 'দেবীগর্জন'-এর পর 'গর্ভবর্তী জননী', 'আজ বসন্ত', 'লাশ ঘুইরা ঘাটক, 'চুল্লী' কিংবা 'হাঁসখালির হাঁস' পরবর্তী এই নাটকগুলিতে এই শক্তিই আরও বিস্তৃত হয়েছে মাত্র। জীবন পরিণামের নতুন কোনো দিক আলোচিত হয়নি।

নাটক অনুসারে আলোচনা : -

স্বাধীনতা পূর্বকালে লেখা তাঁর প্রথম নাটক ‘আগুন’ (১৯৪৩ খ্রি.) 'অরণি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাংলার আকাশে বাতাসে পঞ্চাশের মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষের আগুনের পটভূমিকায় সমস্ত বাংলার পেটের আগুনকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। পাঁচটি দৃশ্যের চালচিত্রে যুদ্ধকালীন নানা সমস্যা যেমন খাদ্যাভাব,রেশনিং ব্যবস্থার দুর্নীতি, লাইন এর অনিবার্যতায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সংযোগ এবং জনসাধারণের ক্রমাগত অসন্তোষ ও আসন্ন বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে রূপ দিয়েছেন নাট্যকার। নাটকটির পরিকল্পনা করেছিলেন নাট্যকার র‍্যাশনের চালের জন্য দাঁড়ানো বিভিন্ন ধরনের মানুষের কিউ দেখে। ঐ কিউতে তিনি জনসংহতির একটা বীজ-সম্ভাবনা দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। নাটকটির তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যে দেখা যায় একটি শ্রমিক ও একটি মধ্যবিত্ত পরিবার সবাই দু'মুঠো চাল পাওয়ার জন্য উদগ্রীব। পঞ্চমদৃশ্যে দেখা যায় সিভিক গার্ডের আচরণের প্রতিবাদে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়। সংকটের মুহূর্তে জাতিগত ও সম্প্রদায়গত বিভেদ ভুলে গিয়ে নিজেদের কোনোক্রমে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে এই সাধারণ লোকগুলো জীবনের মুখোমুখি বাঁচবার সংগ্রামের হদিশ পায়। কিউ এ দাঁড়ানো একজন প্রতিবাদ করে—‘যথেষ্ট তো হয়েছে। এখন বাঁচতে হবে। বাঁচতে হলে মিলেমিশে থাকতে হবে ব্যাস্।”(১)স্ত্রী মনোরমাকে হরেকৃয় জানান ‘রক্ষক’-ই হয়েছে আসলে ‘ভক্ষক’ ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের কথা। তবে নাট্যকার নাটকটির পরিণতিতে শুধু দুঃখ ও হাহাকারের কথা না বলে তা থেকে উত্তরণের দিক নির্দেশও করেছেন, নাটকের অন্তিম দৃশ্যে দলবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ হবার আভাস দিয়ে।

ঐ বছরেই বিজন ভট্টাচার্য লেখেন দ্বিতীয় একাঙ্ক 'জবানবন্দী'। এই নাটকে গ্রাম উৎপাটিত কৃষক জীবনের যন্ত্রণা রূপায়িত হয়েছে। নাটকটি পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিতেই রচিত।নাটকে দেখা যায় মহামারী, মৃত্যু, ক্ষুধা, রোগ, নিঃসম্বল মানুষগুলোকে ঘরছাড়া করে শহরে আনে। দেখা যায় বাঁচার জন্য বেন্দার বউ বহির্গামিনী হলে রুদ্ধক্রোধে প্রলোভনকারী জনৈক ভদ্র যুবককে বেন্দা সনাক্ত করে। নতুন করে বাঁচার সংগ্রামে সোনাধানের স্বপ্ন নিয়ে পরাণ মণ্ডল ফুটপাতে মারা গেলেও তার জবানবন্দির মধ্যেই ধ্রুব শপথ উচ্চারিত -

"তোরা সব ঘরে ফিরে যা। আমার সেই মরচে পড়া লাঙ্গল ক'খানা আবার শক্ত করে চেপে ধরগে মাটিতি। সোনা বেন্দা, সোনা ফলবে।"(২)

বৃদ্ধ পরাণের এই অন্তিম অভিলাষে আছে জীবনের জয়গান, নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন, যৌথ সংঘবদ্ধ জীবনের দৃপ্ত ঘোষণা। পরবর্তী ‘নবান্ন' নাটকে দেখি মুমূর্ষু পরাণ মণ্ডলের চোখের সোনাধানের স্বপ্নই প্রধান সমাদ্দারের চোখে প্রতিভাত হয় জবাকুসুমসংকাশং রূপে। নাটককার দেখিয়েছেন মৃত্যুকে বরণ করবার দুর্দমনীয় সংকল্প ঘোষণার মধ্য দিয়ে সে করে মৃত্যুকে অস্বীকার। নাটকটির প্রথম তিনটি অঙ্কে ব্যক্ত হয়েছে দরিদ্র কৃষকের দুর্গতির কথা, শেষ অঙ্কে ব্যক্ত হয়েছে দুর্গতির উত্তরণ ও আগামী

দিনের প্রতিরোধ ও সংগ্রামের কথা। নাট্যকার স্বয়ং ভূমিকাতে নাটকের পটভূমি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন—

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আধিদৈবিক দুর্ঘটনা এবং দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে চূড়ান্ত একটা পরিণতির দিকে নিষ্ঠুরভাবে অগ্রসর হয়েছে।" (৩)

বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের ইঙ্গিত আছে নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে প্রধানের স্ত্রী পঞ্চাননীর নেতৃত্বদান ও আত্মনিবেদনের মধ্যে। 'নবান্ন'-র শুরু হয়েছে একটা প্রতিরোধের দৃশ্য দিয়ে। এই প্রতিরোধে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ১৯৪২-এর সংগ্রামে মুখ্য চরিত্র প্রধান সমাদ্দারের দুই ছেলে আর স্ত্রীর আত্মাহুতিতে। নাটকের শেষে আবার দেখা যায় সেই প্রতিরোধের সংকল্প সব হারানো দয়াল মণ্ডলের উক্তিতে -

"কিন্তু এ কথাও যেন প্রধান, যে গতবারের মতো এবার আর আকাল আচম্বিতে এসে আমার চোখের ওপর থেকে আমারই পরিজন, আমারই স্বজন... ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না, এদের নিতে হলে আগে আমাকে নিতে হবে, আমারে ঘায়েল করতে হবে, এটা ব্যবস্থার ওলট-পালট করে ফেলে দিতে হবে প্রধান, তবে যদি পারে। জোড় প্রতিরোধ প্রধান এবার। জোড় প্রতিরোধ!"(৪)

সেই মন্বন্তর, মহামারী-কালোবাজারি, মহাজন, জোতদারের শোষণ-পীড়নের প্রেক্ষাপটে শেষ দৃশ্যে দয়ালের কণ্ঠে প্রতিরোধের এই ধ্বনি শোষক-পীড়ক-শাসক শক্তির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সংগ্রামের ইঙ্গিত দেয়। নাটকটি শেষ হয়েছে সবাই মিলে এক একদিন জোট বেঁধে এক একজনের জমির ধান কেটে ঘরে তুলে। দেবে বলে। শম্ভু মিত্রের ভাষায়—'নাটক 'নবান্ন' যেন শ্মশানচারী ভৈরব শিবের মূর্তি। কোনো মিথ্যে নেই। কোনো ছলাকলা নেই।"(৫) 'অবরোধ' নাটকে মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত জয়ের ইঙ্গিতই বহন করে। ধর্মঘটী শ্রমিকরা গেট ভেঙে কারখানায় ঢোকে। মৃত্যুর আগে শ্রমিক নেতা গজানন। পণ্ডিতকে বলে -

"পণ্ডিতজী তুম তো বহুৎ ভালে আদমী হো; দুখিওঁকে লিয়ে তুম লড়াই হো তুম ইস্কা বদলা লেনা।"(৬)

'জীয়নকন্যা' গীতিনাট্যটি রচনা প্রসঙ্গে নাট্যকার জানিয়েছেন -

"১৯৪৫-এ দেশভাগের আশঙ্কায় 'জীয়নকন্যা' লিখি, 'ক্যালাস্' দেশনেতা ও'ক্যালাস্' সরকারের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ।" (৭)

সমকালীন পরাধীন ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতামুখী মুমূর্ষু পটভূমিকায় ঐক্যবদ্ধ, সংগ্রামী নবজাগরণের উজ্জীবনী মন্ত্রদানেই এই নাটকের রূপকে মারণ শক্তির পরাজয়ে সংহত জীবনের জয়গান ঘোষিত। পরের বছরই বিজন ভট্টাচার্য লেখেন দুটি একাঙ্ক 'কলঙ্ক' ও 'মরাচাঁদ'। গোরা সৈন্যদের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের সংঘবদ সংগ্রামে ইতিবাচক দিক এ 'কলঙ্ক' নাটকেও দেখা যায়। ১৯৫১ সালে লেখা 'জননেতা' নাটকে স্বাধীনতা পরবর্তী

ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ও পদের লোভে জনদরদের জন প্রতারকের ভূমিকা তুলে ধরেছেন। সেখানে জননেতা, শোষক, ব্যবসায়ী সব এক। তবে শোষিত শ্রেণির বাস্তব জীবনযন্ত্রণার মধ্যে উচ্চকোটি ও জননেতার মনুষ্যহীনতার বিপরীতে শোষিত শ্রেণির প্রতিরোধের ইঙ্গিতে নাটকটি শেষ হয়েছে। পঞ্চাশের দশকে দেশ ভাগ ও পরবর্তী বাস্তুচ্যুত সম্প্রদায়ের আবেগ ও অবস্থান, হতাশা, জীবনবোধ ও সংগ্রামকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার 'গোত্রান্তর' নাটকে। তবে এ নিছক উদ্বাস্তু সমস্যামূলক নাটক নয়। জীবন অভিজ্ঞতার কঠিন সংগ্রামে মধ্যবিত্ত হরেন মাস্টার বস্তিবাসীর উচ্ছেদের দিনে সব ঐতিহ্য, সংস্কার ও বিচ্ছিন্ন জীবনবাদিতা থেকে সরে গিয়ে সব বিভেদ ভুলে জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে জীবন সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন, অর্থাৎ তার 'গোত্রান্তর' হচ্ছে, তার ইতিহাস আছে এই নাটকে। ভেঙে পড়া বস্তিবাসীদের উজ্জীবিত করেন হরেন মাস্টার –

"বুড়ি জোকার দেও, শঙ্খ বাজাও, মাইয়া উঠাও ঘরে। হেই বিশ্বকর্মার পুতের দল, চুপচাপ খাড়াইয়া আছস্, হাত লাগাইতে পারস না তরা? হাত চালাও, কাম কর, উঠাও বস্তি।" (৮)

সমবেত কণ্ঠে জয়গান ওঠে জীবনের। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার জানিয়েছেন—

"নাম গোত্র জলাঞ্জলি গেলেও কেন মেয়ের গোত্রান্তরে বিয়ে হবে না,আত্মপ্রত্যয়শীল শম্বুক কেন বৃহত্তর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের রাঙা টুকটুকে বর নয়, সংস্কারান্ধ মধ্যবিত্ত মানুষের এই যুব সত্য অস্পষ্ট থাকলেও বৃহত্তর মানব সমাজের চৈতন্যবুদ্ধির দরবারে এই প্রশ্নের উত্তর চূড়ান্তভাবে সাব্যস্ত।" (৯)

এও যেন শ্রেণিবিভক্ত সমাজের বিরুদ্ধে এক অভিনব প্রতিবাদ।

১৯৪৬-১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ পনেরো বছর ধরে লেখা 'মরাচাঁদ' নাটকে নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন— "আর্ট এবং আর্টিস্টিই মরাচাঁদ। মানুষ ক্রিয়েশন বজায় রাখতে সংগ্রামকে হারিয়ে ফেলেনি। নর্থ বেঙ্গলের অন্ধ গায়কের জীবনভাষ্যতে তাই শুধু সংগ্রাম নয়, শিল্পীর কাজ শুধু গান গেয়ে যাওয়া।"(১০)

তাই হতাশাগ্রস্ত পবনকে দুঃখ-দারিদ্র্য থেকে বাঁচিয়ে খাদ্যের দাবির সভায় গান গাইতে নিয়ে যান রাজনৈতিক কর্মী শচীনবাবু, ব্যথাহত ব্যক্তিজীবনের গান বুভুক্ষু সাধারণ মানুষের প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নতুন জীবনে তাদের উদ্বুদ্ধ করে। অপরাহত জীবনশিল্পী পবনের সংগ্রামী শিল্পীসত্তাই তার ব্যক্তিগত দুঃখকে অতিক্রম করে জয়ী হয়। বীরভূমের আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবন ও সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে লেখা 'দেবীগর্জন' নাটকটি ১৯৬৬ সালে প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকেও দেখি দরিদ্র আঁধিয়ার সাঁওতাল প্রজা মংলার মধ্যস্বত্বভোগী প্রভঞ্জনের শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ—'বে-আইনী সুদ দিব নাই। নামাই দাও পাথর, বন্ধ করি দাও মাপজোপ! '(১১) প্রভঞ্জনের লাঠিয়াল তার মাথা ফাটিয়ে দিলেও তারা কেউ মাথা নিচু করে না। সূচনা থেকেই প্রতিবাদের কণ্ঠ বেশ জোড়ালো। কৃষকদের দুঃখ-যন্ত্রণা দিয়ে নাটকের শুরু হলেও নাটকের শেষে দেখা যায় সমবেত সাঁওতাল প্রজারা বুক চাপড়ে মরে যায়নি, তারা সংগ্রাম করেছে এবং সেই সঙ্গে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে -

"এবার নিজ মূর্তি ধরতে হবেক। কারণ ধর্মগোলায় আজ ধরমনাশ হইয়েছে। লক্ষীর ঝাঁপিঠো নুলা দিয়া টানি লিছে শয়তান—ইটার একটা ফয়সালা দরকার!" (১২)

শেষে অকালবোধনের অনুস্মৃতিতে জোতদারের ধর্মগোষ্ঠীর অবরোধ ভেঙেছে সংঘবদ্ধ কৃষকের দল। মহিষাসুর বধের স্থির চালচিত্রে এবং পশ্চাতে মহাকালীর তাণ্ডব নৃত্যে যেন স্বয়ং দেবীর কৃষকদের আহ্বানে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে মর্ত্যে আগমন। নিপীড়িত কৃষকদের সম্মিলিত অস্ত্রের ঝিলিকে সাঙ্গ হয়েছে জোতদার প্রভঞ্জন নিধন পালা। দেশ স্বাধীন হলেও, সরকার পাল্টালেও শাসন, শোষণ ও অত্যাচারের অবসান ঘটে না—এটাই নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন।

নাটকের সাধারণ লক্ষণ : -

তাঁর নাটকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের রূপায়নে কিছু সাধারণ লক্ষণ আছে।যেমন -

(১) নাট্যকার তাঁর নাটকগুলিতে এই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বিষয়টিকে আঁকতে বেশ কিছু চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। কখনও বাঘের হিংস্রতায়, কখনও মও হাতির টোটেমে শাসক ও শোষক শ্রেণির চরিত্রকে গভীর ও জটিল রূপ দিয়েছেন নাট্যকার। যেমন - 'দেবীগর্জন' নাটকে রাজনৈতিক কুচক্রী, কুটবুদ্ধি ত্রিভুবনের সঙ্গে দাবা খেলা রুখতে নাট্যকার ব্যক্ত করেছেন **প্রভঞ্জনে**র দানবীয় ও নারী লোলুপ মত্ততার রূপটি।

(২) কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শে দীক্ষিত বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নাটকগুলির বিষয় নির্বাচন করেছেন মুখ্যত কৃষক-জোতদার ও জমিদার কেন্দ্রিক। শ্রমিক-শিল্পপতিকে নিয়েও দু-একটি নাটক লিখেছেন। সাধারণ খেটে খাওয়া, নিম্নবিত্ত, ভদ্রেতর মানুষেরাই তাঁর নাটকে চরিত্র হয়ে উঠেছে। কৃষক, মজুর, বেদে, আদিবাসী, ভিখারি ইত্যাদি নানা চরিত্রের ভিড়ে তথাকথিত উচ্চবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণির সংখ্যা স্বল্প।

তাঁর নাটকগুলিতে খলচরিত্রের দ্বৈত ভূমিকা—বাইরে ভালো মানুষ, নিরীহ, কর্তব্যপরায়ণ, ভেতরে ভেতরে লোভী, শঠ, ঈর্ষাকাতর, ভয়ংকর ক্ষতিকারক। যেমন—'দেবীগর্জন' নাটকের প্রভঞ্জন, ত্রিভুবন, 'জননেতা' নাটকের নরেন্দ্রনাথ। পাশাপাশি তার নাটকগুলিতে প্রধান, পবন, হরেন মাস্টারের মতো কিছু প্রবীণ চরিত্র আছে যারা প্রবল মার খেয়েও জীবনের চেয়ে বড় একটা মাপে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁদের আদর্শ ও বিশ্বাসকে একটা অমোঘ শাস্ত্রে রূপান্তরিত করেন।

৩) শুধু সংলাপ নয়, গান সংযোজনের মাধ্যমে নাট্যকার নিজেদের অধিকার অর্জনের পথটিকে নির্দেশ করেছেন। যেমন—গায়েন পবনের গানে উজ্জ্বল আশাবাদের সুর শুনি আমরা -

"বাঁচব বাঁচব রে, আমরা বাঁচব রে বাঁচব

ভাঙা বুকের পাঁজর দিয়া নয়া বাংলা গড়ব।" ১৪

৪) প্রতিবাদী প্রতিবেদনে তাঁর নাটকে মঞ্চ নির্দেশনাও গুরুত্ব পেয়েছে।

‘দেবীগর্জন’ ও ‘নবান্ন’ প্রভৃতি নাটকে একই মঞ্চে একদিকে শোষক ও অন্যদিকে শোষিত শ্রেণিকে উপস্থাপনা করে বৈপরীত্য ও বৈষম্যের প্রকটতাকে চিত্রিত করেছেন। এছাড়া অভিনয়ের সময় আলোকসম্পাতের ওপরেও (কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকার) গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কৃষকদের হাতে জোতদারের পতন একেবারে দেবী দুর্গার অসুর নিধনের কম্পোজিশানে ঐতিহ্য ও সংগ্রাম নতুন ডাইমেনশান লাভ করেছে। নাট্যকার স্বয়ং প্রায় প্রতিটি নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন— 'নবান্ন'তে প্রধান সমাদ্দার, ‘দেবীগর্জন'-এ প্রভঞ্জন, ‘মরাচাঁদ’-এ পবন বাউল।

উপসংহার : -

‘আগুন’ নাটকে যে প্রতিরোধের ভাষা প্রথম উচ্চারিত হয়েছে তাই যেন পরবর্তী নাটকগুলিতেও একটি সামগ্রিক রূপ পায়। ব্যক্তিগত জীবনেও বিজন ভট্টাচার্য ছাত্র আন্দোলন, অসহযোগ মহিষবাথান, লবণসত্যাগ্রহে জড়িয়ে পড়েছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরূপে সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার লড়াই তাকে আকৃষ্ট করে। তারই প্রকাশ তার নাটকগুলিতেও—‘কমিউনিস্ট পার্টি’ আমায় নাট্যকার করেছে। (১৫)‘গোত্রান্তর' নাটকের ভূমিকায় ‘নবান্ন-জবানবন্দীর' রচনার প্রেক্ষাপট আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদধর্মীতার উৎসটি—

"ঘরে যেদিন অন্ন ছিল না, নিরন্নের মুখ চেয়ে সেদিন আমি নবান্ন লিখেছিলাম..... বঞ্চনা-প্রবঞ্চনায় স্বল্পচিত্ত খর্বপ্রাণ, কিন্তু হঠাৎ অনিবার্যভাবেই এসে দাঁড়ায় সংঘাতের মুখোমুখী। কেননা সখেন জীবন সর্বদাই অস্থির—প্রাণ সমুদ্র কখনও আপোষ করে না।" ১৬

বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যদর্শনে দেখি বাঁচার জন্য চাই প্রতিরোধ, সংগ্রাম। এটাকেই তিনি দুঃখ-দারিদ্র্যপীড়িত-কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির মানুষের অত্যাচারী শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর নাটকে বলিষ্ঠ আশাবাদকে তিনি তুলে ধরেছেন। কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের জয় ঘোষণায় তাঁর নাটকের সমাপ্তি। দুঃখ, দুর্দশা সমস্যা সংকটে কাহিনির সূত্রপাত হলেও জোটবদ্ধ প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ শেষে সমাধানের ইঙ্গিত দেন। বেঁচে থাকার শেষ সম্বলটুকু যখন শোষক শ্রেণি অধিগত করে, মার খেতে খেতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অবস্থানে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষগুলোর যূথবদ্ধভাবে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও সংগ্রামের মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়ানোর বিষয়টি বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে পর্ব থেকে পর্বান্তরে অত্যন্ত নিপুণভাবে উঠে এসেছে, হয়ে উঠেছে নাটকগুলি নবজীবনের ভাষ্য।

উৎসের সন্ধানে : -

১। নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : 'বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ' ,প্রথম খন্ড, নাটক, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৮, পুন:মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ১১

২। তদেব, পৃ. ২৯

৩। তদেব, পৃ. ৩৭

৪। তদেব, পৃ. ১১৫

৫। প্রসঙ্গ : নাট্য–ডিসেম্বর, ১৭৭১, পৃ. ১২৭-১২৮

৬। বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড নাটক, পৃ. ১৯০

৭। বিজন ভট্টাচার্য : 'অভিজ্ঞতার থিয়েটার', সাক্ষাৎকারভিত্তিক রচনা, গন্ধর্ব, বিজন সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫

৮। বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড নাটক, পৃ. ৩৯৮

৯।তদেব, পৃ. ৩৪৪

১০। ঊষাপতি বিশ্বাস, বিজন ভট্টাচার্যের দেবীগর্জন, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫, দ্বিতীয় সংস্করণ জুন, ২০০৬, পৃ. ২০

১১। তদেব, পৃ. ৯৪

১২। তদেব, পৃ. ১২৪

১৩। তদেব, পৃ. ভূমিকা/ 'তেরো'

১৪। তদেব, পৃ. ৪৪৪

১৫। বিজন ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার, দৈনিক কালান্তর, ৩১ জুলাই, ১৯৭৬

১৬। বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড নাটক, পৃ. ৩৪৩

সহায়ক গ্রন্থ :

১। অজিতকুমার ঘোষ : বাংলা নাটকের ইতিহাস', প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি, ২০০৫

২। অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় : 'নবান্ন', তৃতীয় সংস্করণ নভেম্বর ২০০৯, রত্নাবলী, ৫৫ ডি, কেশবচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯

৩। নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বিজন ভট্টাচার্য রচনাসংগ্রহ-১-নাটক। প্রথম প্রকাশ পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৬, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

৪। পবিত্র সরকার : 'নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ', অখণ্ড সংস্করণ। প্রথম অখণ্ড দে'জ সংস্করণ মার্চ ২০০৮, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩

৫। মন্দিরা রায় : 'বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্ম ও সমকালীন প্রেক্ষিত', প্রথম প্রকাশ ১৯৯২ প্রথম সংস্করণ ২০১০, প্রজ্ঞা বিকাশ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯।

■ **সম্ভাব্য প্রশ্নবলি : -**

১. বাংলা নাটকের ইতিহাসে বিজন ভট্টাচার্যের অবদান ।

২. বিজন ভট্টাচার্যের নাটকের মূল লক্ষণগুলি কি কি ।